Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-2 January 2025

নিখিলেশ রায়ের কবিতায় সময়ের স্বর

জনক বর্মণ

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/02/20_Janak-Barman.pdf

সারসংক্ষেপ: নিখিলেশ রায় নব্বইয়ের দশকের একজন প্রতিনিধিস্থানীয় কবি। কবিতা তাঁর কাছে কোনো অলীক কুসুম-কল্পনা নয়, বাস্তবের মাটিতে শেকড় সঞ্চালন করেই তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর কবিতা আমাদের নিয়ে যায় এক বিজ্ঞাপিত সময়ের কাছে। যেখানে সত্য বলে কিছু নেই, ইতিহাস বিস্মৃত মানুষের বুকে কোনো আদর্শ নেই। এক শূন্যতায় ভরা জীর্ণপ্রায় সময় বুকে নিয়ে মানুষ এগিয়ে চলেছে আরো এক বৃহৎ শূন্যতার দিকে। যন্ত্রসভ্যতার প্রবল আগ্রাসনের মুখে দাঁড়িয়ে কবি নিখিলেশ রায় যেন বারবার পূর্ণ সত্যের অবয়ব খুঁজতে চেয়েছেন। সময়ের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের অধিকারের প্রশ্নে তাঁর কবিতা ঝলসে উঠেছে কখনো, কখনো প্রান্তিক মানুষের ম্রিয়মান কণ্ঠস্বর নিয়ে মুখর হয়ে উঠেছে। উত্তরবঙ্গের মানুষ তিনি। উত্তরের প্রকৃতি মা মাটি মানুষের প্রতি তীব্র মমত্ববোধ তাঁর কবিতায় এক মায়াময় অন্তর্লোক তৈরি করে।

সূচক শব্দ: প্রবহমান সময়, বিদ্রোহ, দেশের মাটি, প্রন্তিক মানুষ, গ্রামীণ জীবন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

সময় প্রবহমান। যুগ-যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে সময় এগিয়ে চলেছে তার আপন খেয়ালে। আদিম মানুষের বিবর্তন, সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে রাজ-রাজাদের হাজার কাহিনি, দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধের তীব্র ধ্বংসের মাঝখানে দাঁড়িয়েও সময় বলে গেছে তার কথা। সেই সঙ্গে নতুন চিন্তা চেতনার যুক্তিজাল বিছিয়ে সভ্যতাও এগিয়ে গেছে অনেকটা পথ। সাহিত্যের গতিপথ আসলে সময়কে আঁকড়ে ধরেই বলে গেছে মানুষের কথা, জীবনের গভীরতর অসুখের কথা। কবির ভেতর, শিল্পীর ভেতর বারবার আঘাত করেছে সময়ের এই ভাঙা-গড়া। আর তার ফলেই আমরা কবিতার ভেতর পেয়েছি সময়ের স্বর। কবিতার পরতে পরতে রয়ে গেছে ইতিহাসের সোচ্চার কণ্ঠ। সময়ের প্রবল দাবি মেটাতে গিয়ে কবির শব্দ কখনো ঝলসে উঠেছে, কখনোবা বিষণ্ণতার দীর্ঘশ্বাসে বেদনাবিদুর হয়ে গেছে।

মানুষের চেতনা সময়ের ঘাত-প্রতিঘাতে বারবার পরিবর্তিত হয়ে গেছে। উনিশ শতকের যে বাঙালি সমাজে সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ প্রথার মতো হাজার কুসংস্কার আঁকড়ে ছিল, সময়ের দাবিকে ধারণ করে প্রগতিশীল চেতনায় সেই সময়কেই যেন এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো মনীষীরা। উনিশ শতকে আমেরিকার দাসপ্রথার বিরুদ্ধে কলম ধরে হ্যারিয়েট বিচার স্টো যেমন লিখেছেন কালজয়ী উপন্যাস 'আঙ্কল টমস্ কেবিন'(১৮৫২), তেমনি এই বাংলাদেশে 'নীলদর্পন'(১৮৬০) নাটক লিখে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন দীনবন্ধু মিত্র। আবার পরাধীন ভারতবর্ষে নিপীড়িত, অত্যাচারিত মানুষের বুকে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে নজরুল ইসলামের মতো কবি এসেছেন। জলের বাঁধভাঙা প্লাবনের মতো তিনি শুনিয়ে গেছেন 'অগ্নিবীণা' কখনো 'বিষের বাঁশি'—

"ওই দিকে দিকে বেজেছে ডঙ্কা, শঙ্কা নাহিকো আর!
'মরিয়া'র মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে মার মার!
রক্ত যা ছিল ক'রেছে শোষণ,
নীরক্ত দেহে হাড় দিয়ে রণ!
শত শতাব্দী ভাঙেনি যে হাড়, সেই হাড়ে ওঠে গান —

জয় নিপীড়িত জনগণ জয়! জয় নব উত্থান!
জয় জয় ভগবান"[১]

এই তো এভাবেই সমাজ সময় ও সাহিত্যের অঙ্গানে মানুষ তার নিজস্ব চিন্তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। মানুষের ইতিহাস তাই সময়েরই ইতিহাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে যেভাবে বিশ্বায়ন আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করেছে, কবিতার ভিতরেও আমরা সেই প্রভাব লক্ষ করি। টিভি, কম্পিউটার, মোবাইল, ইমেল থেকে শুরু করে প্রযুক্তির নানান দিগ-দিগন্ত মানুষের জীবনে নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। কম্পিউটারের স্ক্রিনে গোটা দুনিয়ার খবর, ঘটনা উঠে এল — এ যেন এক বিশাল জানালা খুলে গেল। সেই জানালায় চোখ পেতে কবিরা দেখল, ধীরে ধীরে কীভাবে একা হয়ে যাচ্ছে মানুষ। গোটা পৃথিবী হাতের মুঠোয়, অথচ পৃথিবী থেকে যেন অনেকটা বিচ্ছিন্ন। সারা পৃথিবীর খবর রাখছে মানুষ অথচ পাশের বাড়ির অসুস্থ মানুষটির খবর জানে না। রাশিয়া ইউক্রেন হামলা করেছে সে খবর জানে অথচ পাশের গ্রামে কার বাড়িতে আগুন লেগে সমস্ত পুড়ে ছাই তা জানার চেষ্টা করে না। কবি নিখিলেশ রায়ের কবিতা যেন ঠিক তারই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নতুন করে নিজের দিকে তাকাতে বলে, নিজের দেশ জাতি-মাটির দিকে তাকাতে বলে। আত্মমগ্নতার গভীরে গিয়ে তিনি যেন বারবার বলতে চান —

"ঘরে ঘরে রবিশস্য সূর্যালোকিত নত রাত্রি
মগ্ন জন সেই বার্তা কুটিরে প্রাসাদে
এই মাঠে নুয়ে আছে একটি বালক ঋতু, শস্যকুমার
হাতে বাঁশি বুকে প্রেম শস্য বোঝেনা ঘটা করে"[২]

নিখিলেশ রায়ের কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে কবি-অধ্যাপক অলোক সাহা লিখেছেন — "আমার মা'র ভাষা ভালো দিনকার তিনপুরানি মণি মুক্তায় ঠাসা একটা আলাদা ভাষা, এটা কোনো ভাষার উপভাষাও না হয়, শাখা ভাষাও না হয়। সেই আমার নিজের মা'র ভাষাত কথা কবার চাই, সাহিত্য আর সংবাদ লেখির চাই। আমার কথা আমার ঢক করি কবার চাই। আমার কথা আমার ঢক করি কবার দেও, আমার ঢক করি লেখির দেও। অন্য কাণ্ডো তো আর আমার কথা ভালবাসিয়া কবেন না, লেখিবেনও না। ঝায় ঝায় লেখিছেন তায় হয় বনেয়া লেখিছেন, না হয় মিচ্ছাং খানেক শিখিয়া পণ্ডিতি দেখের গেইচেন, ব্যবসা করির গেইচেন — আমরা ঐলা বন্ধ করির কই। মৌলবাদী গুলার নাখান উমরা যদি আমাক অচ্ছুৎ করির চান করুন, বাধা দিবার চান দেউক। আমার কাজ আমরা যেংকরি হউক, তেংকরি করিমুই, করিমু।"[৪]

নিজের ভাষা ও ধর্ম নিয়ে মানুষ এমনি এমনি রাজনীতি করে না, মাতৃভাষার প্রতি যখন একটি বিরুদ্ধ দল বা গোষ্ঠী ক্রমাগত আক্রমণ করে, যখন সেই ভাষাকে মানুষের মুখ থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়, শুধুমাত্র ভাষার কারণে যখন মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, তখন প্রয়োজন হয়ে পড়ে বিদ্রোহের কখনোবা রাজনীতির। এই ভাষাবিপ্লব থেকেই জন্ম নিতে পারে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, স্বাধীন জাতি।

কবি নিখিলেশ রায় উত্তরবঙ্গের মানুষ, কোচবিহারের একটি প্রান্তিক গ্রাম খোলটায় তাঁর প্রথম জীবন ও বেড়ে ওঠা। রাজবংশী ভাষা তাঁর মাতৃভাষা। নব্বইয়ের দশকে এই ভাষায় সাহিত্য রচনা করার জন্য শাসকদলের রোষানলে পড়তে হয়েছিল রাজবংশী বহু কবি সাহিত্যিককে। তাঁদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়ে, জঙ্গি আখ্যা দিয়ে বারবার একঘরে করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। কবি নিখিলেশ রায় কালজানির বাঁধভাঙা জলের মতো উদ্দাম ঢেউ বুকে নিয়ে মাতৃভাষার মুক্তির জন্য পণ করেছিলেন। 'মেধার ঘরে হুনসুমারি' কাব্যগ্রন্থটি তারই ফসল যেন। এখানে 'হুনসুমারি' শব্দটিকে লক্ষ করলে বোঝা যাবে, শব্দটি কিন্তু বাংলা শব্দ নয়, এটি একটি রাজবংশী শব্দ। যার অর্থ হলো 'অতর্কিতে প্রবেশ', মেধার ঘরে, বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞানের ঘরে অতর্কিতে প্রবেশ। কারা প্রবেশ করেছে? —

"তারা আজ আগুনে ভেসেছে, আরও পোড়ো গঙ্গাজল, পিতা
মৃতেরা আয়ুর জন্য রাত্রিদিন অশন ছেড়েছে

তাই কাঁপে বিন্ধ্যদেশ, তাই জাগে আকস্মিক টান
মানুষেরা গাছদেহে বসতি পেতেছে
গাছেরা চেঁচিয়ে বলে — আমাকে বাঁচান।"[৫]

কবির মগ্ন চেতনার ভেতর এইভাবে কথা বলে উঠেছে সেইসব পরাজিত মানুষ, তাঁদের বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা। কখনোবা গাছেদের চীৎকার। এই চীৎকার শোনার কান সবার থাকে না।

নিখিলেশের কবিতায় সময় কেবল একটি কালানুক্রমিক ধারণা মাত্র নয়, বরং মগ্ন চেতনার ভেতর বহু অনুভব ও অভিজ্ঞতার দলিল। 'গাছেরা চেঁচিয়ে বলে—আমাকে বাঁচান'— এখানে এসে যেন থমকে যেতে হয় আমাদের। পিছন ফিরে তাকাতে হয়। সভ্যতার আদিকাল থেকে গাছই মানুষের আশ্রয়স্থল। বৃক্ষের পাতা ফল মূলে নির্বাহ হয়েছিল তাদের জীবন। যন্ত্রসভ্যতার বিস্তার, মানুষের লোভ-লালসা, তথাকথিত প্রগতির আগ্রাসনে বনভূমি আজ নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। যা ছিল আশ্রয় মানুষের, তাকেই নষ্ট করার যজ্ঞে মেতে উঠেছে মানুষ। অর্থ-প্রতিপত্তি, আরো চাই, আরো চাই এ-এক তীব্র নেশা। গাছেদের কান্নার শব্দ কবি শুনতে পেয়েছেন, মানুষের কান্নার মতোই তা যেন অশ্রুসজল।

নিখিলেশ রায়ের কবিতা আমাদের কখনো নিয়ে গেছে বিজ্ঞাপিত সেই সময়ের কাছে যেখানে সমাজের চারপাশে মানুষ সাজিয়ে রেখেছে ভালোবাসার মেকি সজ্জা। এখন সত্য নেই কিছু, ইতিহাস বিস্মৃত মানুষের বুকে কোনো আদর্শ নেই। এক শূন্যতায় ভরা জীর্ণপ্রায় সময় বুকে নিয়ে মানুষ এগিয়ে চলেছে আরো এক বৃহৎ শূন্যতার দিকে। নিরন্তর কাদাজলের ভেতর ডুব দিয়ে তবু কিছু মানুষ মুক্তোর সন্ধান করতে চান। সব জেনে বুঝেও এক মানবিক ভুলের জন্য আঘাত পেতে চান। কথাকল্পময় মেঠোপথে বিষাদ কবি হেঁটে যেতে যেতে খুঁজে নেন জোনাকির ভাষা —

"আমিও বিরতিহীন বসে থাকি, হেঁটে যেতে থাকি
কথাকল্পময় পর্ব শেষ হলে অতঃপর নৈঃশব্দ আসে
মনে হয় আজ কিছু প্রাণবীজ, আজ কিছু ধান্য ফলিবে
কারণ, কবিতার কোন শব্দ কোনদিন
মৃত্যুতে সংযত থাকে নি।"[৬]

যদিও আবহমানকালের বাংলা কবিতার নিরিখে নিখিলেশ রায় মূলত 'প্রেমিক কবি' নামেই বেশি পরিচিত। তাঁর 'বৃষ্টি পদাবলী' (২০০১) কাব্যগ্রন্থটি বাংলা কবিতার ইতিহাসে রোমান্টিসিজমের একটি নবতম সংযোজন বলা চলে। এখানে 'বৃষ্টি' যেন রাধার অভিসারের নতুন পথ রচনা করেছে। আত্মাকে পরমাত্মার কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে পথ বৈষ্ণব কবিরা নির্মাণ করেছিলেন চতুর্দশ শতকে, ২০০১ সালে এসে কবি যেন সেই পথেই হেঁটে যেতে যেতে রচনা করেছেন এক অনন্ত শোকগাথা। বেদনাবিধুর সেই জলভাষ্য — কখনো রূপকের আড়ালে কখনোবা মিতভাষ্যে। অবিরল অথচ মৃদু সেই স্বর —

"বউটি নদীর জল তোমাকে ডাকছি
আর দেখছি কত দ্রুত তুমি স্রে যাচ্ছো আলোর ওপারে
তারা ফুটছে আর তারা ঝ'রে যাচ্ছে তোমারই জলে
আমার এই পারাপারহীন ডাক কখনও কি বিদ্ধ করতে পারবে তোমাকে"[৭]

"জানতে চাই না কোথায় নিয়ে যাবে ঐ
অশ্রুপতন অভিজাত রৌদ্রের ভিতর এই বৃষ্টিসংবাদ
এখনও যদি অকৃত্তিম অত দ্রুত কেন তবে গ্রহণে এসেছে
বিস্মরণে ফলেছে সন্তান"[৮]

কলকাতার সংবাদ মাধ্যম কত সহজেই কোচবিহারকে 'প্রান্তিক শহর' বলে আখ্যায়িত করে। সেই প্রান্তিক শহরেরই এক প্রান্তিক কবি নিখিলেশ রায়। তাই তো তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে সেই প্রান্তিক মানুষদের কথাই। যাদের ভাষা বিলুপ্তপ্রায়, যাদের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে বাস্তবতার নির্মম পরিহাসে। অথচ ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে আমরা দেখি, তথাকথিত সেই প্রান্তিক মানুষদের জমি-জায়গা সমস্ত দখল করে বসে আছে অভিজাতরা। গড়ে উঠেছে অট্টালিকা-মল-রেস্তোরাঁ আর সুবিশাল ফ্ল্যাটবাড়ি। শোষণযন্ত্রের চাকায় পিষ্ট সেই 'অনাদি মণ্ডল', 'বুধনি এক্কা', 'বিজু সোরেন', 'এতোয়া মুণ্ডা', 'ধামাসু কামার'রা একুশ শতকে এসে নিজেদের লড়াই, সংগ্রাম অস্তিত্বের সংকটের কথা বলতে চেয়েছেন কবির 'বুধনি এক্কা ও অন্যরা' (২০০৯) কাব্যগ্রন্থে —

"কবে থেকে খরা নেই, কবে থেকে বৃষ্টি ঝরে না,
কবে তার নদী বুজে গেছে, শিরিলের না আসার মত কবে হপ্তা আসে না
এতোয়া মুণ্ডার কাছে এতো সব নিরীহ খবর হলুদ পাতার
শুকনো গান হয়ে আছে"[৯]

"শূন্যতা বেড়ে উঠছে দ্বীপের মতো, প্রদীপের মতো; আর আমি
আলোকিত শস্যের বীজ পুঁতে ফেলছি শেষ শাদা জায়গাটির পরে
এই গানে সোজা হচ্ছে ধামাসু কামার ও তার ব্যর্থ শিরদাঁড়া"[১০]

আত্মজীবনীর পাতায় পাতায় কবি নিরন্তর ভেঙে চুড়ে দেখেছেন নিজেকে, নিজের সময় ও চারপাশকে। কবি ধর্মকে চেয়েছেন মুক্তির পথ হিসেবে, সংস্কারকে চেয়েছেন জাতির পরিচয়কে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। কোনো গোঁড়ামি তাঁর মনন ও চিন্তাকে অবরুদ্ধ করে দিতে পারেনি। তিনি ভুলে যাননি বাস্তবতাকে। কল্পনার রঙিন মেঘের স্পর্শে উদ্বেল হয়ে কবি রচনা করতে চাননি কবিতার নিজস্ব গ্রামটিকে। সেখানে অভাব আছে, দারিদ্র্যতা আছে, সেই সঙ্গো আছে বেঁচে থাকার তীব্র নেশা —

"আমাদের আশে পাশে কত শব্দ হয়, ভাতের চিড়ের শব্দ, হাসির...
একবার উঠোনে যায় ছোটবোন, একবার রাস্তার উপরে
অভুক্ত খিদের মত ভয় হয়, জনসংখ্যা গুনি
ওরে বোন, ফিরে আয় তোর সঙ্গো আর কিছুক্ষণ বেঁচে থাকি।"[১১]

মুক্তিকামী কবি পুরাণের দেশ থেকে তুলে এনেছেন বহু অনুষঙ্গ। কেবল পুরাণের মায়াজাল নির্মাণ নয়, সেখানেও সক্রিয় ছিল তাঁর যুক্তিবাদী মন। কেবল 'রামায়ণ', 'মহাভারত' নয় লোকপুরাণের বিভিন্ন প্রতিমা ব্যবহার করে তিনি নিজস্ব একটি জগৎ গড়ে তোলেন — যেখানে উঠে এসেছে বেহুলার কথা, মনসার ব্রত পালনের কথা, চাঁদ সওদাগরের কথা। 'মহাভারতে'র অন্যতম চরিত্র কর্ণকে নিয়ে তিনি লেখেন তাঁর আর একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ, 'কর্ণের মাদুলি' (১৯৯৭)। এখানে কর্ণকে তিনি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে নতুন করে দেখতে চেয়েছেন, এ যেন পুরাণের নবনির্মাণ। কর্ণের ভেতরে যে কুরুক্ষেত্র নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত করেছে, এ যেন প্রতিটি মানুষের ভেতরে বয়ে চলা জীবনযুদ্ধ —

"কুয়াশা ঘন অশ্বারোহীর পথে
পাথর বাঁধা জগদ্দল এক রথে
জলের মত কথা
শীতের রাতেও একটি দুটি মানুষ এসে ক্রমে
জয় দিয়ে তার ব্যর্থতার ঢাকবে সকল ব্যথা।"[১২]

আমরা কবি নিখিলেশ রায়কে নিরপেক্ষ কবি বলতে চাইনা। তিনি পক্ষপাতী। কিন্তু তাঁর এই পক্ষপাত আসলে কাদের প্রতি ভেবে দেখার বিষয়। উত্তরবঙ্গের মানুষের ভাষা, মাটি — মানুষ, এখানকার নিম্নবর্গীয় জীবন এদের প্রতি তাঁর মমতার অন্ত নেই।

জীবন এদের প্রতি তাঁর মমতার অন্ত নেই। উত্তরবঙ্গাকে তো 'মিনি ভারতবর্ষ' নামেও ডাকা হয়। এই ভারতবর্ষে যখন চিকিৎসার জন্য একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল না থাকে কবি কষ্ট পান, যখন এখানকার চা-বাগানগুলো বন্ধ হয়ে যায় একের পর এক, কবি চুপ থাকতে পারেন না। কালে কালে নিপীড়িত এই মানুষদের কণ্ঠ যেন তাঁর কলমে কথা বলতে চেয়েছে — এখানেই তিনি ব্যতিক্রমী এবং সার্থক।

তথ্যসূত্র:

১. নজরুল ইসলাম, 'সঞ্চিতা', বাংলা বাজার, ঢাকা দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৪, পৃ. ৮৬
২. নিখিলেশ রায়, 'কবিতা সংগ্রহ', সম্পাদক রঞ্জন রায়, সোপান, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কোচবিহার বইমেলা, ২০২০, পৃ. ১২৫
৩. ওই, পৃ. ২৩৩
৪. নিখিলেশ রায়, 'নিকিলাইয়া রাজবংশী একাডেমী', শিবমন্দির, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, পৃ. ৮
৫. নিখিলেশ রায়, 'কবিতা সংগ্রহ', সম্পাদক রঞ্জন রায়, সোপান, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কোচবিহার বইমেলা, ২০২০, পৃ. ৬৩
৬. ওই, পৃ. ১৮৬
৭. ওই, পৃ. ১৪৪
৮. ওই, পৃ. ১৪৯
৯. ওই, পৃ. ২০৭
১০. ওই, পৃ. ২১০
১১. ওই, পৃ. ৯৫
১২. ওই, পৃ. ৯৪

লেখক পরিচিতি: জনক বর্মণ, গবেষক, উত্তরবঙ্গা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গা।